৭

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভূমিকাঃ

বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং সামরিক শক্তির বিকাশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। রুশ ঐতিহাসিক কে. আন্তনেভার (K. Antonova) মতে,"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্যান্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও ভারত তার মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত বিজ্ঞান, সাহিত্য, চারুকলায় তার অগ্রগতি অন্যান্য জাতির সৃজনশীল মননকে অনুপ্রাণিত করেছে"। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনন্য। ব্যাপক আয়তন ও বিশাল জনসংখ্যার কারণে ভারতকে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য শুধু আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়াতে নয় বরং সমগ্র এশিয়ার একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সাথে সাথে ভারত সাফল্যের সাথে তার স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পার করেছে। এ কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনায় 'ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে।

আসুন এবারে 'ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' শীর্ষক ইউনিটের পাঠের বিষয়কে নিম্নে উল্লেখিত ৫ (পাঁচ) টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করি ঃ

◆ *পাঠ - ১ ঃ ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।*
◆ *পাঠ - ২ ঃ ভারতের শাসন বিভাগ।*
◆ *পাঠ - ৩ ঃ ভারতের আইন পরিষদ।*
◆ *পাঠ - ৪ ঃ ভারতে বিচার ব্যবস্থা।*
◆ *পাঠ - ৫ ঃ ভারতের দলীয় ব্যবস্থা।*

পাঠ-১ ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভারতের সাংবিধানিক বিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে সে দেশের সংবিধান।

যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সে দেশের সংবিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান হলো দেশের একটি প্রামাণ্য সামাজিক-ঐতিহাসিক দলিল। এটি হল দেশ ও দেশবাসীর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত একটি দলিল বিশেষ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে সে দেশের সংবিধান। তাই অধ্যাপক ফাইনার (Finer) একে "মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাগত পার্থক্যের আত্মজীবনী" বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর ভারতীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে বলা যায়- এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ সংবিধান। ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর ৩৯৫ টি ধারা এবং ৮টি তফশীল নিয়ে গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। ১৯৯১ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৭৮ বার সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানে ৪০৭ টি ধারা ১০টি তফশীল আছে।

ভারতের সংবিধানের বিকাশ

১৯৪৭ সালের ২০ শে আগস্ট বি. আর. আম্বেদকরের নের্তৃত্বে একটি খসড়া সংবিধান তৈরীর জন্য কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এ কমিটি গণপরিষদে একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে। সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সংবিধানটি গৃহীত হয়। অন্যান্য দেশের মত ভারতের সংবিধানও একটি গতিশীল দলিল। বিগত বছরগুলোতে কেবল আয়তনের দিক থেকেই নয়, বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেও সংবিধানের বহু পরিবর্তন এবং বিকাশ সাধিত হয়েছে।

সাংবিধানিক রীতি-নীতি

ভারতের সংবিধানের অনুপূরকরূপে সাংবিধানিক নীতি-নীতির উদ্ভব ঘটেছে। এতে সংবিধানিক আইনের অপূর্ণতা দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং সংবিধানের গতিশীল চরিত্রও অব্যহত থেকেছে। ভারতের সংবিধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাংবিধানিক নজিরও সংবিধান বিকাশের একটি কার্যকরী মাধ্যম। তবে নজির যেমন সৃষ্টি হয়েছে তা' লংঘিতও হয়েছে। রাজনীতির দ্রুত পট পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতপক্ষে নজির রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ, প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাধারণত সাংবিধানিক নজির অনুসরণ করা হয়।

সংশোধন পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের বিকাশ ঘটেছে। সংবিধানের গতিশীলতা বজায় রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো চাহিদা অনুযায়ী-এর সংশোধন। সংশোধন বলতে সংযোজন এবং বর্জন উভয়ই বুঝায়। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত মোট ৭৮ বার ভারতের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে।

আইন প্রণয়ন

সংসদ প্রণীত বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে সংবিধান বিকশিত এবং সম্প্রসারিত হয়েছে। সংবিধানে সংসদের হাতে কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকা এবং বিশেষ ব্যবস্থায় রাজ্য তালিকায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। বিদেশের সাথে সন্ধি ও চুক্তি, মৌলিক অধিকার প্রয়োগ, জন-প্রতিনিধিত্ব, বিচার বিভাগীয়

পদ্ধতি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, এবং রাজ্য পুনঃগঠন বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে সংসদ সংবিধানকে অর্থবহ ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে।

আদালত

বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে ভারতের সংবিধান বিকাশের একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। আদালত আইনের ব্যাখ্যা ও বৈধতা বিচারের মাধ্যমে সাংগঠনিক আইনের ত্রুটি দূরীকরণে সাহায্য করে।

শাসন বিভাগীয় সিদ্ধান্ত

শাসন বিভাগীয় কার্যকলাপ সংবিধান বিকাশে সাহায্য করেছে। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্ধারিত নীতি সংবিধানকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন এবং সংবিধানের বিকাশে সাহায্য করেছে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাই উপরোক্ত বিষয়াবলী ভারতের সংবিধান বিকাশে সহায়তা করেছে।

ভারতের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

- সংবিধানের বিশালতা বা বৃহৎ আয়তন;
- ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব;
- বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রভাব;
- প্রস্তবনা;
- মৌলিক অধিকার;
- নির্দেশমূলক নীতি;
- নাগরিকের কর্তব্য;
- ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র;
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা;
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অস্বীকৃতি;
- সংসদীয় শাসনব্যবস্থা;
- সংসদের সার্বভৌমিকতা এবং আদালতের প্রাধান্যের সমন্বয় সাধন;
- সুপরিবর্তনীয়তা এবং দুস্পরিবর্তনীয়তার সম্মিলন;
- শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতি;
- সার্বজনীন ভোটাধিকার;
- দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি;
- সমাজের অনুন্নত অংশের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা;
- বিশেষ পদাধিকারী ও সংস্থার আলোচনা;
- জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা;
- ভাষা সম্পর্কিত বক্তব্য;
- দলত্যাগ বিরোধী ব্যবস্থা।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য

ভারতের সংবিধানকে যদি মুকুটের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে প্রস্তাবনা হলো তার শোভাবর্ধনকারী রত্নবিশেষ। গণপরিষদের জনৈক সদস্য এভাবেই প্রস্তাবনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল উৎস হল ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর গণপরিষদে জওহর লাল নেহেরু কর্তৃক উত্থাপিত সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রস্তাব। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি "সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের রূপায়ন রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' শব্দত্রয় সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানে সংযোজিত প্রস্তাবনার সাহায্যে সংবিধানের আদর্শগত ভিত্তি, উৎস, কাঠামো অনুধাবন করা সম্ভব। সংবিধানের মূল অংশের চাবিকাঠি প্রস্তাবনার মধ্যে নিহিত। এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। প্রস্তাবনার মাধ্যমে ভারতের সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রাধান্যকারী ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে ভারতের তৎকালীন বিচারপতি কে. সুব্বারাও মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রস্তাবনা সংক্ষেপে সংবিধানের আদর্শ ও আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করেছে (The preamble contains, in nutshell, its ideals and aspirations)

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

পৃথিবীর সব দেশের সংবিধানই পরিবর্তিত হয়। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। সংবিধানের ৩৬টি ধারায় সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ আছে। সাধারণত সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তনের ৩টি পদ্ধতি আছে। সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

- ভারতের সংবিধানের বিশেষ কয়েকটি ধারা আছে যাদের সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সংসদ সংশোধন করতে পারে। সংসদের যে কোন কক্ষেই বিল উত্থাপন করা যায়। প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করলে বিলটি সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতির সমর্থনের দরকার হয়।

- সংবিধানের যে সব বিষয় ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বার্থ এবং এক্তিয়ারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে বিষয়গুলোর সংশোধন পদ্ধতি ৩৬৮ (২) নং ধারায় উল্লেখ আছে। এ সংশোধনের জন্য প্রত্যেক সংসদের যে কোন কক্ষে বিল উত্থাপন করা যায়। বিল অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম পক্ষে সংসদের প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু ঐ দুই তৃতীয়াংশকে সংশ্লিষ্ট কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমান হতে হবে। এভাবে সংসদের উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট বিলকে অঙ্গ রাজ্যের আইন সভার অনুমোদন নিয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেয়া হয়।

- সংবিধানে ৩য় অংশে সংযোজিত মৌলিক অধিকার এবং ৪র্থ অংশে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতি এবং পূর্বে আলোচিত সংশোধনে ১ম ও ২য় পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়, এ বিষয়গুলো সংশোধনের জন্য সংসদের যে কান কক্ষে বিল উত্থাপন করা হয়। অনুমোদনের জন্য প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। তবে প্রত্যেক কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশকে ঐ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমান হতে হবে। এভাবে সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হলে বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। ঐ আইন অনুসারে সংবিধান সংশোধিত হয়।

সারকথা

ভারতের সংবিধান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান। এটি একটি গতিশীল দলিল। সাংবিধানিক নজীর, সংবিধান সংশোধন, আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন, আদালতের সিদ্ধান্ত এবং শাসন বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কারণে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বিশাল আয়তন, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, সুপরিবর্তনীয়তা ও দুস্পরিবর্তনীয়তার সম্মিলন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন নীতির কারণে এ সংবিধান স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকেছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধানে, সংবিধান সংশোধনের ৩টি পদ্ধতির স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ সংবিধান কোন দেশের?
   ক. ভারত;
   খ. ব্রিটেন;
   গ. জাপান;
   ঘ. ইরান।

২. ভারতের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক কখন গৃহীত হয় -
   ক. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি;
   খ. ১৯৪৮ সালের ১১ই এপ্রিল;
   গ. ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর;
   ঘ. ১৯৪৯ সালের ২০শে আগস্ট।

৩. ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ভারতের সংবিধান মোট কতবার সংশোধিত হয়েছে?
   ক. ৭১ বার;
   খ. ৭৮ বার;
   গ. ৭৬ বার;
   ঘ. ৮১ বার।

৪. ভারতের সংবিধান কি প্রকৃতির?
   ক. সুপরিবর্তনীয়;
   খ. দুষ্পরিবর্তনীয়
   গ. সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয়;
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

উত্তর মালাঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভারতের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের সংবিধানের বিকাশে কোন্ নিয়ামকগুলো ভূমিকা পালন করেছে?
২. ভারতের সংবিধান সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ-২ ভারতের শাসন বিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সাংবিধানিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ভারতের মন্ত্রীসভার গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সাংবিধানিক স্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদ নিয়ে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ গঠিত। শাসন বিভাগের অরাজনৈতিক অংশ হচ্ছে প্রশাসন বা আমলাতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। সমমর্যাদা সম্পন্ন মন্ত্রীদের গঠিত মন্ত্রীপরিষদই রাষ্ট্রপতির নামে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী পরিচালনা করে। প্রকৃতিগত দিক থেকে কেন্দ্রের শাসন বিভাগ বহু ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব এতদূর বর্ধিত হয়েছে যে, অনেক সমালোচক ভারতকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার' নামে অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সাংবিধানিক স্থান

ভারতের সংবিধানে আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের শাসন বিভাগের প্রধান। বাস্তবে তিনি হলেন নাম সর্বস্ব (Titular) বা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী তিনি মন্ত্রি পরিষদের সাহায্য এবং পরামর্শ অনুযায়ী কার্যপরিচালনা করতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারেন না।

শাসন বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী এবং শাসন বিভাগের সকল ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও অপসারণ, সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষমতা তিনি ভোগ করেন।

আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া তিনি অধিবেশন আহবান, বিলে সম্মতি দান, অর্ডিন্যান্স জারী, সদস্যপদের যোগ্যতা নির্ধারণ করেন। ৮৬ (১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে কোন কক্ষে অথবা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সদস্যদের উপস্থিতির জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

আর্থিক বিষয়াদি সংক্রান্ত ক্ষমতা

১১২ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পরবর্তী বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় বরাদ্দের আনুমানিক হিসেব সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি অনুপূরক বাজেটও পেশ করতে পারেন। এছাড়া তিনি জরুরি তহবিল নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরামর্শ অনুযায়ী এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা বলতে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ও সশস্ত্র বিদ্রোহজনিত আপদকালীন অবস্থা, রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা, এবং আর্থিক জরুরি অবস্থাকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য ক্ষমতা

এছাড়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ, ভাতার অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ বিশেষ রাজ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ এবং রাজ্যপাল নিয়োগ, আইনের কোন বিষয়কে কার্যকর করার বাধা অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করতে পারেন।

ভারতের মন্ত্রীসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন বিভাগের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব পাশাপশি বিদ্যমান। একদিকে অলঙ্কারিক প্রধান এবং অন্যদিকে শাসন বিভাগের প্রকৃত বা কার্যকরী সত্ত্বা । ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ সরকারের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রিপরিষদ কিভাবে কোন পদ্ধতিতে গঠিত হবে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংবিধানে নেই। কেবল উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। সাধারণতঃ লোক সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারী দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে এবং ঐ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন। মন্ত্রীপরিষদের আয়তন, গঠন, পুনর্গঠন, দপ্তর বন্টন এবং মন্ত্রীদের অপসারণ প্রধানমন্ত্রী ও শাসকদলের উপর নির্ভর করে।

সংবিধানের ২টি ধারা ৭৪ এবং ৭৫ ধারায় মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনায় সাহায্য এবং পরামর্শ দান করা এদের দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদের কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত না হলে রাষ্ট্রপতি তা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি সেই প্রস্তাব সংশোধিত বা অসংশোধিত অবস্থায় সম্মতির জন্য পাঠায় তবে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করতে বাধ্য। উপরন্ত, মন্ত্রিপরিষদের বৈধতা সম্পর্কে বা পরামর্শের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে তা হলো সরকারী নীতি প্রণয়ন, আইন প্রণয়নে উদ্যোগ নেয়া, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধন, আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ইত্যাদি।

দায়িত্বশীলতা

বিভিন্ন দপ্তরের বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী আইনসভায় পেশ করেন। সুতরাং মন্ত্রীর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার অর্থ আইনসভা কর্তৃক মন্ত্রিসভার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা যৌথভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে বা অপসারিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সাংবিধানিক অবস্থান

ভারতের শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরূত্বপূর্ণ হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কেবল কেন্দ্রীয় সরকারেরই নন, সমগ্র দেশের প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় চরিত্র। সরকারী কাঠামোর ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি অনুসারে প্রধানমন্ত্রীই শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান। তাঁকে কেন্দ্র করেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলী, নীতি-নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার রূপায়ন আবর্তিত হয়। সাম্প্রতিককালে ভারতের সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাবের মাধ্যমে নিজের পদমর্যাদাকে যেভাবে অলঙ্কৃত এবং সংহত করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে এমন কোন দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই এত ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় নি। প্রধানমন্ত্রী কেবল 'সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান'- এর ভূমিকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, তিনি নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিরোধহীন নেতা/নেত্রীতে পরিণত করেছেন। কাঠামোগত দিক থেকে সংসদীয় ব্যবস্থা থাকলেও, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো প্রধানমন্ত্রী শাসিত (Prime Ministerial form of Government) ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা পরিচালনার পদ্ধতি

ভারতের শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে। এ অবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী পদের রাষ্ট্রপতিকরণ' (Presidentialisation of the Prime Minister) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংবিধানে বিস্তৃত কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তা' সংবিধান নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তার কার্যাবলীর কিছু অংশ সংবিধানে উল্লেখ আছে, বাকী অংশ সাংবিধানিক রীতি-নীতি ও প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভরশীল। তিনি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তা' মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবেই প্রয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলীর দু'টি দিক থেকে বিচার করা যায়। সরকার প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী এবং দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী।

সরকার প্রধান হিসাবে

- প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ গঠন, মন্ত্রীদের দপ্তর পরিবর্তন, কোন মন্ত্রীর পদত্যাগ, অপসারণ, বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন এবং সরকারী নীতি প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূখ্য উদ্যোগ নেন।
- কোন কোন মন্ত্রীকে নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হবে, সংখ্যা কত হবে প্রধানমন্ত্রী তা স্থির করেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া কোন বিষয় ক্যাবিনেটের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।
- রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রী কাজ করেন।
- রাষ্ট্রপতির সাথে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক শুধু আইনের সীমানার মধ্যেই থাকে না। তাঁদের রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরেও নির্ভরশীল।
- সরকার প্রধান হিসাবে দেশে এবং বিদেশে প্রধানমন্ত্রী ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রধান রূপকার এবং মূখ্য প্রবক্তা।
- প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা।
- সংসদীয় দলের নেতা, অধিবেশন আহবান এবং সমাপ্তি ঘোষণা করা এবং লোকসভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা মূখ্য।
- অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্ধারণী কাজ প্রধান।

দলের নেতা হিসাবে ঃ

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকার পরিচালনা, দলীয় কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন, সরকারের ঘোষিত কর্মসূচীর জনপ্রিয়তা এবং সর্বাপেক্ষা জনমানসে সরকার সম্পর্কে তিনি কি ভাবমূর্তি উপস্থাপন করেছেন, তার উপর শাসকদলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

সারকথা

ভারতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তাঁর নামে শাসনবিভাগীয় কার্যাবলী পরিচালিত হয় এবং তিনি তাঁর নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন। লোকসভায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে এবং ঐ দলের নেতা/নেত্রী প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতিকে কার্য পরিচালনার সাহায্য এবং পরামর্শ দান ছাড়াও কিছু নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে। প্রধানমন্ত্রী শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান। বর্তমানে তার ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে অনেকে ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত' বলে অভিহিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভারতের শাসন ব্যবস্থায় আইন অনুযায়ী কেন্দ্রের শাসন বিভাগের প্রধান -
ক. প্রধানমন্ত্রী;
খ. রাষ্ট্রপতি;
গ. মন্ত্রীপরিষদ;
ঘ. কোনটিই নয়।

২. কাঠামোগত দিক থেকে সংসদীয় ব্যবস্থা থাকলেও, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো -
ক. সংসদ শাসিত;
খ. রাষ্ট্রপতি শাসিত;
গ. প্রধানমন্ত্রী শাসিত;
ঘ. মন্ত্রীসভা শাসিত।

৩. প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তা -
ক. মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসাবে;
খ. দলের নেতা হিসাবে;
গ. রাষ্ট্রপতির পরামর্শক হিসাবে;
ঘ. একজন মন্ত্রী হিসাবে।

৪. ক্যাবিনেট বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেন -
ক. রাষ্ট্রপতি;
খ. মন্ত্রিপরিষদ;
গ. জনগণ;
ঘ. প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা কোন প্রকৃতির ?
২. রাষ্ট্রপতি কি ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের মন্ত্রিসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।
২. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক অবস্থান এবং তার কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

পাঠ-৩ ভারতের আইন পরিষদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভারতের পার্লামেন্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ (রাজ্যসভা ও লোকসভা) -এর মধ্যে পারস্পরিক সাংবিধানিক সম্পর্ক বুঝতে পারবেন;
- ভারতের পার্লামেন্টে 'আইন প্রণয়ন পদ্ধতি' সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভারতের পার্লামেন্টে পার্লামেন্টারী কমিটিগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুতরাং ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আইনসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে আইনসভা কেন্দ্র ও রাজ্যে এ উভয় কেন্দ্রেই আছে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ হলো দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারতের শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য এবং পদ্ধতি অনুসরণে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের কাঠামোর প্রকৃতিগত বিন্যাস সাধন করেছেন। ভারতের সংবিধান ৭৯ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা এবং লোকসভা নিয়ে সংসদ গঠিত।

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আইনসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের আইনসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

লোকসভা ও রাজ্যসভা ভারতের আইনসভার ২টি কক্ষ। লোকসভা হচ্ছে নিম্নকক্ষ বা জনপ্রিয় কক্ষ এবং রাজ্যসভা হচ্ছে উচ্চকক্ষ।

রাজ্যসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সংবিধানের ৮০ নং ধারায় রাজ্যসভার গঠন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এ ধারা অনুসারে অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। এর মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য এবং ২৩৮ জন নির্বাচিত সদস্য। রাষ্ট্রপতি ১২ জনের কম সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন। মূলত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি ঐ সদস্যদের মনোনীত করেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্য হতে বাকী ২৩৮ জন সদস্য নির্বাচিত হন। সাধারণভাবে প্রত্যেক রাজ্যের ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ লক্ষের জন্য ১জন সদস্য নির্বাচিত হন। পরে প্রতি ২০ লক্ষ লোকের জন্য ১ জন করে অতিরিক্ত সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। রাজ্যসভা সাধারণ বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে লোকসভার সমান ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আর্থিক বিষয়ে রাজ্যসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। লোকসভা কর্তৃক গৃহীত বিল রাজ্যসভা প্রত্যাখান করতে পারে না। সরকার গঠন, তার কার্যকাল নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণে এ সভার প্রকৃত কোন ক্ষমতা নেই। মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যসভার নিকট দায়িত্বশীল নয়। রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর অপসারণের ক্ষমতা এ কক্ষের আছে এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে।

লোকসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

লোকসভা হল সংসদের নিম্ন-পরিষদ এর জনপ্রিয় কক্ষ। এ কক্ষের সদস্যগণ প্রতক্ষ্যভাবে সার্বজনীন ভোটের দ্বারা গঠিত নির্বাচকমন্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন। মূল সংবিধানে উল্লেখ ছিল, লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫২৫ এর বেশি হবে না। এর মধ্যে ৫০০ জন বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন এবং অনধিক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত হবেন। ১৯৭৩ সালে ৩১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মোট সদস্য সংখ্যা করা হয় সর্বাধিক ৫৪৫ জন। যার মধ্যে অনধিক ৫২৫ জন বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি, এখন এ সংখ্যা রাজ্যে ৫৩০ এবং কেন্দ্রে

১৩ এবং অনধিক ২০জন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি। রাজ্যের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় জনসংখ্যার অনুপাতে। লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর।

সরকার গঠনের ক্ষেত্রে একমাত্র ভূমিকা লোকসভার। লোকসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই সরকার গঠন করে। সে হিসেবে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব তাদেরই, অনাস্থা এনে লোকসভায় বিরোধী দল সরকারের পতন ঘটাতে পারে। এভাবে লোকসভা মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ বিল সংক্রান্ত লোকসভার ক্ষমতা অনুমোদন ব্যতীত সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব কার্যকর করা যায় না। লোকসভার নির্বাচনমূলক ও অপসারণমূলক ক্ষমতা আছে। সংবিধান-সংশোধন সংক্রান্ত বিল, রাজ্যের ভৌগলিক সীমানা পরিবর্তন, নাম পরিবর্তন বা রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল, জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য কোন প্রস্তাব, জরুরি অবস্থার মৌলিক অধিকার কার্যকর করার উপর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত কোন আদেশ, রাজ্যে সাংবিধানিক অচল অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার অনুমোদনের প্রস্তাব প্রভৃতি কার্যকর করা জন্য লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

লোকসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই সরকার গঠন করে।

লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংবিধানিক সম্পর্ক

ব্রিটেনের দু'টি কক্ষের সম্পর্কের আলোকে ভারতে দু'টি কক্ষের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন সংবিধান প্রণেতাগণ। লোকসভাকেই তারা আইনগত দিক থেকে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। রাজ্যসভার ভূমিকা মূখ্যত অঙ্গ রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন এবং লোকসভার অবিবেচনাপ্রসুত ক্ষমতা প্রয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ। আইনগত দিক থেকে রাজ্যসভা লোকসভার অনুগত কক্ষে পরিণত হয়েছে। রাজ্যসভা লোকসভার নীরব সহযোগী। সরকার গঠন, সরকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক বিষয়ের উপর লোকসভার নিয়ন্ত্রণ রাজ্যসভার অস্তিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভার সাথে সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

আইনসভায় আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আইন প্রণয়ন হল আইনসভার প্রধান দায়িত্ব। সংসদে কোন বিল উত্থাপন করা হবে - প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্যাবিনেট সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। ভারতের সংবিধান সাধারণ বিল এবং অর্থবিল ও অন্যান্য অর্থ সম্বন্ধীয় বিল সম্পর্কে ভিন্ন পদ্ধতি সংযোজন করেছে।

সাধারণ বিল

এ বিল পাশের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মন্ত্রীগণ। নির্দিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে কোন কক্ষে বিল উত্থাপন করেন। বিল পাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যথা ঃ

বিলের প্রথম পর্যায়

মন্ত্রীকে প্রথমে বিল উত্থাপনের জন্য সভার অনুমতির প্রস্তাব পেশ করতে হয়। লোকসভায় স্পীকার এবং রাজ্য সভায় চেয়ারম্যান সভার নিকট অনুমতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। অনুমোদন লাভের পর মন্ত্রী বিল উত্থাপন করেন এবং সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বিলের ২য় পর্যায়

বিলের উত্থাপক সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানোর প্রস্তাব করতে পারেন। প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন। রাজ্যসভা থেকে এক-তৃতীয়াংশ এবং লোকসভা থেকে কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নেয়া হয়। স্পীকার সভাপতি মনোনীত করেন।

৩য় পর্যায়

কমিটি পর্যায়ে বিলটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান এর শেষে সুপারিশসহ বিলটি সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিকট প্রেরণ করেন।

৪র্থ পর্যায়

এ পর্যায়ে বিলের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। বিলের বিভিন্ন অংশের উপর আলোচনা এবং সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাখ্যানের শেষে বিলের ৪র্থ পাঠের পর্যায় অতিক্রান্ত হয়।

৫ম পর্যায়

এ সময় মৌখিক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। প্রস্তাবক বিলটিকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেন। ঐ কক্ষে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সাংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটি গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠপর্যায়

সংসদের ১টি কক্ষে বিলটি গৃহীত হবার পর অন্যকক্ষে প্রেরিত হয়। অন্য কক্ষ যদি বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে তবে বিলের ৬ষ্ঠ পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়।

ভারতের আইনসভার বিভিন্ন কমিটি

পদ্ধতি সংক্রান্ত এবং কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী লোকসভার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য ১২টি কমিটি আছে। প্রকৃতির দিক থেকে কমিটিগুলো বিভিন্ন ধরনের। এগুলো হলোঃ

- কার্য পরিচালনা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি;
- নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি;
- আবেদন বিষয়ক কিমিট;
- সরকারী প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কমিটি;
- অধিকার বিষয়ক কমিটি;
- বিল বিষয়ক সিলেক্ট কমিটি;
- লোকসভার বৈঠকে সদস্যদের অনুপস্থিতি বিষয়ক কমিটি;
- বেসরকারী বিল বিষয়ক কমিটি;
- অধস্তন আইন বিষয়ক কমিটি;
- আনুমানিক ব্যয় বিষয়ক কমিটি;
- সরকারী গাণিতিক কমিটি;
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা সংক্রান্ত কমিটি;

উভয় কক্ষের ৩টি স্থায়ী যুক্তকমিটি আছে। যথাঃ

- সংসদ সদস্যদের বেতন ও ভাতা বিষয়ক কমিটি
- তফসিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিষয়ক কমিটি
- লাভজনক পদ বিষয়ক কমিটি।

সারকথা

রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ) ও লোকসভা (নিম্নকক্ষ) নিয়ে ভারতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত। সংসদের নিম্নকক্ষ বা লোকসভা হচ্ছে জনপ্রিয় কক্ষ। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। লোকসভা রাজ্যসভার তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যসভা, লোকসভার 'নিরব সহযোগী'। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিল বা আইনের খসড়া যেকোন কক্ষে (ক্যাবিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে) উত্থাপন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটি গৃহীত হলে অন্য কক্ষে পাঠানো হয়। এ কক্ষে বিলটি সামগ্রিকভাবে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসহ বিলটি আইনে পরিণত হয়। ভারতীয় আইন সভায় বিভিন্ন কমিটি কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র -
   ক. ভারত;
   খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র;
   গ. ব্রিটেন;
   ঘ. পাকিস্তান।

২. লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ -
   ক. ৩ বছর;
   খ. ৮ বছর;
   গ. ৪ বছর;
   ঘ. ৫ বছর।

৩. সাধারণ বিল পাশের কোন্ পর্যায়ে বিলটি গৃহীত হয় ?
   ক. ১ম পর্যায় -এ;
   খ. ২য় পর্যায় -এ;
   গ. ৬ষ্ঠ পর্যায় -এ;
   ঘ. ৫ম পর্যায় -এ।

উত্তর মালাঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভারতের আইন সভার গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলো কি?
২. লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংবিধানিক সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের আইন সভার উভয় কক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
২. ভারতের আইন সভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪ ভারতের বিচার ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভারতের বিচার ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারেন;
- ভারতের সুপ্রীমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল বিচার বিভাগ। স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ ব্যতীত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। সে কারণেই বিচার বিভাগের এক্তিয়ার ও ভূমিকা আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ প্রচলিত গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী বিচার বিভাগের ভূমিকা স্থির করেছেন। বিচার বিভাগের ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার নির্ধারণে গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

ভারতের বিচার ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য উদারপন্থী ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতের বিচার ব্যবস্থা প্রণীত হলেও তা কোন দেশকেই অন্ধ অনুকরণ করেনি। ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু কিছু কাঠামো স্থির করা হয়। ভারতের বিচার ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

- ভারতের বিচার ব্যবস্থা একটি ঐক্যবদ্ধ ক্রমস্তর ও সংহত বিচার ব্যবস্থা। রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট। রাজ্যের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এর অধীনস্থ। সুপ্রীমকোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।
- ভারতের সুপ্রীমকোর্টের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এটা কেবল আইনের পদ্ধতিগত দিক বিচার করতে পারে। আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি বিচার করতে পারে না। নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় এবং জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার প্রয়োগের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারেন।
- ভারতে একই ধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি প্রচলিত।
- ভারতের সংবিধানে বিচার বিভাগের হাতে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় নি। সংবিধানের ৩৬১ নং ধারায় রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ভারতের বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রিতার দোষে দুষ্ট। বেশির ভাগ মামলাই দীর্ঘকাল অমীমাংসিত থাকে। ১৯৮৫ সালের শেষে সুপ্রীমকোর্টে অমীমাংসিত মামলার পরিমাণ ছিল ৮৭,০০০। ১৯৮৬ সালের ১লা জুলাই এ সংখ্যা ছিল ১,৪০,১৪২ টি। এর মধ্যে ২,৮৫২ টি দশ বছরের পুরানো।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রিতার দোষে দুষ্ট।

- ভারতের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। তবে ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য আইনগত সাহায্য দানের নীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এ নীতি নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত।
- ভারতের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণ আদালতের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে দিল্লীতে গণ-আদালত গঠন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতিপূরণের বিরোধ মীমাংশার দায়িত্ব এ আদালতের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সম্পত্তি এবং বিবাহ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্বও গণ আদালতের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।
- ভারতের বিচারপতিগণ আইন সভা কর্তৃক নয় বরং শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে সংসদ হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
- ভারতে ব্যাপকভাবে জুরির সাহায্যে বিচারের নীতি গৃহীত হয় নি।

ভারতের সুপ্রীমকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ভারতের ক্রমস্তর বিন্যস্ত বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীমকোর্ট। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করেছে। সুতরাং সুপ্রীমকোর্টের এক্তিয়ার নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে। সুপ্রীমকোর্ট ব্যাপক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে ভারতের বিচার ব্যবস্থার অভিভাবকরূপে গণ্য করা যায়।

ভারতে মূল সংবিধানের ১২৪ নং ধারায় উল্লেখিত ছিল যে, বিচারপতি এবং আরো অনধিক ৭ (সাত) জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট গঠিত হবে। বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংবিধানে সুযোগ রাখা হয়েছে। সংসদ সেই সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৬-র এপ্রিল মাসে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা নির্ধারণ করেছে ২৬ জন। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী বিচারপতি (Ad hoc Judges) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

সুপ্রীমকোর্টের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের ১২৬ নং ধারানুযায়ী কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি (Acting Chief Justice)-এর পদ কোন কারণে শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মুখ্য এক্তিয়ার এবং দায়িত্ব হল সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা কর্তার ভূমিকা পালন, আইনের ব্যাখ্যা এবং সাংবিধানিকতা পর্যালোচনা, কেন্দ্র-রাজ্যের অথবা রাজ্যের সাথে রাজ্যের বিরোধ মীমাংসা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, আদালত অবমাননার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আপীল আদালতের ভূমিকা পালন।

ভারতের সুপ্রীমকোর্ট উপরোক্ত সকল ভূমিকা পালনের সাথে সাথে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের এক্তিয়ারকে সম্প্রসারিত করেছে। এদের মধ্যে আছে বিধায়ক এবং সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের স্পীকার এবং চেয়ারম্যান, লোকসভার স্পীকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের পুনঃনিরীক্ষা, নিজের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা, জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে নির্দেশ দান প্রভৃতি। সুপ্রীমকোর্ট অভিলেখ আদালত (Court of Record) রূপেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। সংবিধানে সুপ্রীমকোর্টের এলাকাকে ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

মূল এলাকা

সংবিধানের ১৩১ নং ধারানুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট মূল এলাকার মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ মীমাংসার ক্ষমতা অর্জন করেছে। সংবিধানের অস্পষ্টতাজনিত কারণে যে বিরোধ তার আইনগত সমাধান দেয় সুপ্রীমকোর্ট।

আপীল সংক্রান্ত এলাকা

সুপ্রীমকোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সংবিধান অনুযায়ী, ভারতীয় ভূখন্ডে অবস্থিত যেকোন দেওয়ানী, ফৌজদারী ও অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে ১টি সার্টিফিকেট দিতে হয় যে, মামলাটির সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত।

পরামর্শদান এলাকা

১৪৩ (১) নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, কোন আইন সংক্রান্ত সমস্যায় সুপ্রীমকোর্টের মতামত গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তবে তিনি সুপ্রীমকোর্টের বিবেচনার জন্য বিষয়টি প্রেরণ করতে পারেন। এছাড়া আরো যেসব ক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা হলো ঃ

সুপ্রীমকোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

- সুপ্রীমকোর্ট ১৪২ নং ধারানুযায়ী যে কোন বিষয়ের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ ও ডিক্রী ঘোষণা করতে পারে।
- সুপ্রীমকোর্ট অভিলেখ আদালত (Court of Record) রূপে কাজ করে।
- সুপ্রীমকোর্ট তার পূর্ববর্তী কোন রায় বা ঘোষিত আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে।
- সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করে।

- সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতির সাথে সুপ্রীমকোর্ট প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কিন্তু এর বহু রায় সরকারকে সংবিধান সংশোধনে উদ্যোগী হতে বাধ্য করেছে।
- বিচার-বিভাগীয় পুনঃনিরীক্ষা (Judicial Review) সুপ্রীমকোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা।
- সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা। সংবিধানের কোন অংশের ব্যাখ্যা সুপ্রীমকোর্ট যেভাবে নির্ধারণ করে, সেভাবেই সেই অংশের অর্থ নির্ধারিত হয়।

সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা।

- সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সুপ্রীমকোর্ট রায় দিতে পারে।
- রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যায় সুপ্রীমকোর্টের আদেশই চূড়ান্ত।

সারকথা

ভারতের বিচার বিভাগ দেশের শাসন ব্যবস্থার এক স্বাধীন অঙ্গ। সুপ্রীমকোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। দেশের বিচার ব্যবস্থা অনেকটা ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘসূত্রিতার দোষে দুষ্ট। বিচার ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গণ আদালত। সুপ্রীমকোর্ট ব্যাপক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সুপ্রীমকোর্ট সাধারণত ৩টি এলাকায় কাজ করে। যথাঃ (১) মূল এলাকা, (২) আপীল সংক্রান্ত এলাকা এবং (৩) পরামর্শ দান এলাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো -
   ক. আইন বিভাগ;
   খ. বিচার বিভাগ;
   গ. শাসন বিভাগ;
   ঘ. কোনটিই নয়।

২. ভারতে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত -
   ক. হাইকোর্ট;
   খ. সুপ্রীমকোর্ট;
   গ. জজকোর্ট;
   ঘ. স্থানীয় পঞ্চায়েত।

৩. ভারতের বিচার ব্যবস্থার অভিভাবক -
   ক. রাষ্ট্রপতি;
   খ. প্রধানমন্ত্রী;
   গ. মন্ত্রিপরিষদ;
   ঘ. সুপ্রীমকোর্ট।

৪. সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা -
   ক. আইনসভা;
   খ. যে কোন আদালত;
   গ. সুপ্রীমকোর্ট;
   ঘ. শাসন বিভাগ।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভারতের সুপ্রীমকোর্ট কিভাবে গঠিত হয় ?
২. সুপ্রীমকোর্টের প্রধান এলাকা কয়টি ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের বিচার ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
২. ভারতের সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫

ভারতের দলীয় ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভারতের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ভারতের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের নীতি, মতাদর্শ ও কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর্নেষ্ট বার্কার (Earnest Barker) -এর মতে, "আমরা যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ফলপ্রসু ব্যবস্থারূপে গণ্য করি, তাহলে দলীয় ব্যবস্থাকেও আমাদের স্বীকার করতে হবে।" V. O. Key বলেছেন, "রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়েছে।" বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতে রাজনৈতিক দল সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের দলীয় ব্যবস্থা বৈচিত্র্যপূর্ণ। দলগুলোর সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচী এবং কার্য পরিচালনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এখন আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ভারতের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে।

- **রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেইঃ** ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের বিষয়ে উল্লেখ নেই। কোন আইনের মাধ্যমে এর উদ্ভব হয় নি। গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে।
- **বহুদলীয় ব্যবস্থাঃ** ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, জাতীয় দল ছাড়াও অনেক আঞ্চলিক এবং অন্যান্য রেজিষ্ট্রিকৃত দল আছে।
- **শক্তিশালী ও সংগঠিত একাধিক বিরোধীদলের অনুপস্থিতি ঃ** অদ্যাবধি কংগ্রেস (আই) এবং বিজেপি ছাড়া কোন দল তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী বিরোধী অবস্থানে পরিণত করতে পারেনি।
- **দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রাধান্য ঃ** জওহর লাল নেহেরুর কংগ্রেসে একচ্ছত্র প্রধান্য ছিল। পরবর্তীতে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং একই সূত্র ধরে নরসীমা রাও এ ধারা অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন। বিজেপি-তে লালকৃষ্ণ আদভানী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জনতা দলের ভি. পি. সিং দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রাধান্য রেখেছেন।
- **জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও ভাষাভিত্তিক দল ঃ** শিবসেনা, হিন্দু মহাসভা, ইত্তেহাদুল মুসলেমিন, মুসলিম লীগ, বিজেপি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল। ডি, এম, কে. এবং এ. আই. ডি. এম. ইত্যাদি জাত -পাত (ধর্ম ও) ভাষাভিত্তিক দল। তফসিলী জাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শোষিত দল, বহুজন সমাজ পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি গঠিত হয়েছে। এভাবে ভারতে জাত-পাত, উপজাতি, ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক দল গঠিত হয়েছে।
- **ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের প্রধান্য ঃ** ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলের সাথে নির্বাচনী জোট ও সরকার গঠনে উৎসাহ প্রদান করায় আঞ্চলিক দলকে বৃহত্তর জাতীয় জোটের অংশীদারে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পেয়েছে।

- **মতাদর্শগত পার্থক্য ঃ** ভারতের দলীয় ব্যবস্থার একটা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শগত ভিত্তি। এখানে চরম বামপন্থী থেকে চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দল আছে। আছে মধ্যপন্থী সুবিধাবাদী দল। কোন দল আমূল পরিবর্তনের জন্য বৈপ্লবিক মতাদর্শের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। আবার কোন দল আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থার পক্ষে।

- **রাজনৈতিক দলের ভাঙন ঃ** দলীয় ব্যবস্থার অন্তর্দলীয় কোন্দলের ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা গেছে।

- **প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা ঃ** অনেকের মতে, ভারতের দলীয় ব্যবস্থা প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা□(Dominant Party System) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে কংগ্রেস তার প্রাধান্য বজায় রেখেছে। বর্তমানে বি. জে. পি. ক্ষমতায় আসায় অবশ্য এ প্রাধান্য কিছুটা খর্ব হয়েছে।

- **এককেন্দ্রিক প্রবণতা ঃ** এখানে দলীয় কাঠামো এককেন্দ্রিক প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দলের রাজ্য ও আঞ্চলিক শাখা থেকে শুরু করে প্রতিটি সাংগঠনিক স্তরই দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশ ও নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত।

- **স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সাথে যোগ ঃ** ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

- **দলত্যাগ ঃ** দলত্যাগ ভারতের দলীয় ব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বামপন্থী দল ব্যতীত অন্যান্য দল থেকে ব্যাপকহারে সদস্যগণ দলত্যাগ করেছেন।

- **দলীয় সংহতির অভাব ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঃ** বিভিন্ন দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য, সংহতি এবং শৃংখলার অভাব ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার আরো একটি বৈশিষ্ট্য।

- **জোটবদ্ধ সরকার ও রাজনীতি ঃ** ১৯৬৭ এর পর থেকে এ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জোটবদ্ধ রাজনীতি এবং বিভিন্ন সময়ে জোটবদ্ধ সরকার (Coalition Government) গঠিত হয়েছে।

ভারতের রাজনৈতিক দল

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু দলের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। এ দলগুলোকে আঞ্চলিক ও জাতীয় দলে ভাগ করা যায়। জাতীয় দলের মধ্যে কংগ্রেস (আই), কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), বি. জে. পি., জনতাদল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি দল রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এখানে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

কংগ্রেস (আই)

ব্রিটিশ আমলে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ দলটি স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারীদের প্লাটফর্ম-এ পরিণত হয়। কংগ্রস (আই) স্বাধীনতার পর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এককভাবে সাফল্য অর্জন করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় থেকেছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস রাজ্যসভা ও লোকসভায় ব্যাপক পরাজয়ের ফলে সরকারী ক্ষমতায় হারায়। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কংগ্রেস দলের প্রধান নেতাদের বিরোধের ফলে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (শাসক) ও বিরোধীদের কংগ্রেস (সংগঠন)। ১৯৭৮ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে সভানেত্রী করে গঠিত হয় কংগ্রেস (আই)। ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস (আই) দলকে নির্বাচন কমিশন ভারতের সরকার গঠনে সক্ষম হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী এর হাল ধরেন। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর নরসীমা রাও এবং তারপর সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (আই) গঠিত হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস গঠিত হয়।

কংগ্রেস (আই) দলের সাংগঠনিক কাঠামো ক্রমস্তর বিন্যস্ত। সর্বনিম্ন সাংগঠনিক স্তর হল ব্লক কংগ্রেস। এর উপরে আছে যথাক্রমে জেলা কংগ্রেস এবং প্রদেশ কংগ্রেস। সর্ব ভারতীয় স্তরে আছে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.S.) দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন সভাপতি। সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ সংস্থা। তবে কার্যক্ষেত্রে দলীয় নেতাই সর্বেসর্বা।

মতাদর্শগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বী নেতাদের মঞ্চ ছিল। এককভাবে বামপন্থী বা চরমপন্থী নীতি গ্রহণ না করে সর্বদা সংস্কারবাদী দৃষ্টি বজায় রেখেছে। ১৯৪৮ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় কংগ্রেস এমনভাবে দেশ গড়তে ইচ্ছুক যেখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত বৈষম্য দূর করে সকল ভারতবাসীর জন্য সমান অধিকার এবং সুযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। বর্তমানেও কংগ্রেস (আই) সেই আদর্শকে সামনে রেখেছে।

বি. জে. পি. (ভারতীয় জনতা পার্টি)

১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা প্রাক্তন জনসংঘী নিয়ে এ দল গঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একে পুরানো জনসংঘের নতুন সংস্করণ বলা যায়। এ দলটি হিন্দু মৌলবাদী রক্ষণশীল দল। সাম্প্রদায়িকতাকে উপজীব্য করে বি.জে.পি.-র রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে 'রাম রাজনীতি' তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ দলটি মূলনীতি হিসাবে বলেছে-জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্য। গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র, মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনীতির আদর্শে বিশ্বাসী এ দল বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোর সমর্থক। কৃষি কাঠামোর পুনবিন্যাস, ব্যক্তি মালিকানার অধিকার অব্যাহত রাখা, দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ, দরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, প্রকৃত গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বি. জে. পি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

বি.জে.পি.-র রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে 'রাম রাজনীতি' তে পরিণত হয়েছে।

সারকথা

ভারতে রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকলেও সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা রাখছে। বহু দলীয় এ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-ব্যক্তি প্রাধান্য, সাম্প্রদায়িক দল, আঞ্চলিক প্রাধান্য, দলগুলোর ভাঙন, সংহতির অভাব, মতাদর্শগত পার্থক্য, জোটবদ্ধতা ইত্যাদি। প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস (বর্তমানে কংগ্রেস -আই) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতের রাজনীতিতে সবসময় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বি. জে. পি তাদের সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী নীতি নিয়ে দেশের রাজনীতিতে বেশ ভাল স্থানে অবস্থান করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন।

১. ভারতের দলীয় ব্যবস্থায় নেই -
ক. সাংবিধানিক স্বীকৃতি;
খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা;
গ. দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রাধান্য;
ঘ. কোনটাই নয়।

২. "জোটবদ্ধ সরকার ও রাজনীতি" - এ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে -
ক. ১৯৪৭ এর পর;
খ. ১৯৫৭ এর পর;
গ. ১৯৬৭ এর পর;
ঘ. ১৯৯৭ এর পর;

৩. কংগ্রেস (আই) গঠিত হয় -
ক. ১৮৮৫;
খ. ১৯৪৭;
গ. ১৯৭৮;
ঘ. ১৯৮৪।

৪. বি, জে, পি, হচ্ছে - নতুন সংস্করণ -
ক. জনতা দলের;
খ. কংগ্রেস (আই) -এর।
গ. জনসংঘের;
ঘ. কমিউনিস্ট পার্টির।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তমূলক প্রশ্ন

১. কংগ্রেস (আই) দলের সাংগঠনিক কাঠামো এবং নীতি বর্ণনা করুন।
২. বি. জে. পি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান দু'টি দল কি কি? আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. R L Hardgrave, Indian Government and Politcs, New York: Harcourt Brace, 1970
২. J C Johari, Indian Government and Politics, Delhi: Vishal Publications, 1977
৩. A C Kapur, Select Constitutions, New Delhi: S Chand & Company Ltd., 1996
৪. D Docl, Comparative Government and Politics, New Delhi: Sterling Publishers Ltd., 1982
৫. নির্মল কান্তি ঘোষ, ভারতের শাসনব্যবস্থ ও রাজনীতি, কলকাতাঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ১৯৯৩

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন